লার্নিং অ্যান্ড আর্নিং: আত্মনির্ভরশীলতায় নতুন সম্ভাবনা

অজিত কুমার সরকার*

আইসিটিভিত্তিক অর্থনীতির বিকাশ ও কর্মসংস্থানের সুযোগঃ

বিশ্বে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটেছে তিনটি ধাপে। প্রথমে কৃষিনির্ভর অর্থনৈতিক উন্নয়ন। যা ছিল মানুষের কায়িক পরিশ্রমের উপর নির্ভরশীল। এরপর শিল্পবিপ্লব নাম দিয়ে শুরু হয় শিল্পনির্ভর অর্থনীতির যাত্রা। এখানেও রয়েছে কায়িক শ্রম ও যান্ত্রিকতার মিশেল। যা আজও চলছে। তবে উন্নত দেশগুলো এ থেকে উত্তরণের পথ খুঁজছে। বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে উন্নত দেশগুলোতে তথ্যপ্রযুক্তি বিপ্লব নাম দিয়ে শুরু হয় জ্ঞাননির্ভর অর্থনীতির যাত্রা। আজকের পৃথীবীতে যা ওয়েব বা ইন্টারনেটভিত্তিক অর্থনীতি হিসেবে সুপরিচিত। উন্নত দেশগুলো ওয়েবভিত্তিক অর্থনীতি গড়ে তোলায় প্রথমে গুরুত্ব দেয় প্রশিক্ষণের। শিক্ষিত তরুণ-তরুণীদের তথ্যপ্রযুক্তিতে উন্নত প্রশিক্ষণের সুযোগ করে দেয়। ফলে ওইসব দেশে প্রতিবছর বিপুল সংখ্যক মানুষের কর্মসংস্থান হয়। ইন্টারনেটভিত্তিক অর্থনীতির প্রসার ঘটে অত্যন্ত দ্রুত ।

একবিংশ শতাব্দীর এই সময়ে বলা হচ্ছে, যেসব দেশের তথ্যপ্রযুক্তি খাত বিকশিত সেসব দেশের অর্থনীতিও ততো উন্নত। কাজের সুযোগও সেসব দেশে বেশি। বর্তমান বিশ্বে তথ্যপ্রযুক্তি ছাড়া কোনো দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। তথ্যপ্রযুক্তিতে যারাই বেশি অগ্রগামী তারাই উন্নয়নের ঝড় তুলেছে। আমরা যদি তথ্যপ্রযুক্তিতে অগ্রসরমান দেশগুলোর দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাই ওইসব দেশ তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার ও উদ্ভাবনী প্রযুক্তির প্রয়োগ করে অত্যন্ত দ্রুততার সাথে তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান বোস্টন কনসাল্টিং গ্রুপ (বিসিজি) এক গবেষণায় বলেছে, ২০১৬ সালের মধ্যে জি-২০ ভুক্ত দেশগুলোতে ওয়েবভিত্তিক অর্থনীতি গড়ে উঠবে। ২০১১ সালে জি-২০ ভুক্ত দেশে ওয়েবভিত্তিক অর্থনীতির পরিমাণ ছিল ২.৩ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার। যা ২০১৬ তে গিয়ে দাঁড়াবে প্রায় দ্বিগুণ অর্থাৎ ৪.২ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার। আমাদের পাশ্ববর্তী দেশ ভারতের অর্থনীতির দিকে তাকালে দেখতে পাই, তথ্যপ্রযুক্তির অবদান দেশটির অর্থনৈতিক ভিতকে অত্যন্ত সুদৃঢ় করেছে। বিসিজি'র গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ভারতের ইন্টারনেট অর্থনীতির বিকাশ ঘটেছে অত্যন্ত দ্রুত। ২০১৬ সালের মধ্যে ভারতে ইন্টারনেট অর্থনীতির আকার হবে ১০.৮ ট্রিলিয়ন রুপি বা ২১৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা বিশ্বের প্রধান জি-২০ ভুক্ত দেশগুলোর ইন্টারনেট অর্থনীতির ক্রমোন্নতির তুলনায় অনেক দ্রুতগতির। ভারতের ইন্টারনেট অর্থনীতি বর্তমানে বিশ্বে দ্বিতীয় বৃহত্তম এবং এ খাতে কর্মসংস্থান হয়েছে ২০ লক্ষ মানুষের।

তথ্যপ্রযুক্তিতে বিশ্ব যখন দ্রুত এগিয়ে চলেছে তখন বাংলাদেশের অবস্থা কী সে সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করতে চাই।

আইসিটিভিত্তিক অর্থনীতিতে বাংলাদেশের বাস্তবতাঃ

এ বছরের ২১ জানুয়ারি তথ্যপ্রযুক্তির অন্যতম দিকপাল বিল গেটসের একটি বক্তব্য ছাপা হয় বিল অ্যান্ড মিলিন্ডা গেটস ফাউন্ডেশনের প্রকাশনা সিএনবিসিতে। এতে তিনি বলেন, "By 2035, there will be almost no poor countries left in the world." এ প্রসঙ্গে তিনি তিনটি বিষয়ের উল্লেখ করেন।

এক. ডিজিটাল বিপ্লব;

দুই. ভেকসিন উদ্ভাবন এবং

তিন. উন্নত বীজ উদ্ভাবন। এ তিনটি কারণে ২০৩৫ সালের মধ্যে দারিদ্রমুক্ত পৃথিবী গড়ে উঠবে। এতে প্রধান ভূমিকা পালন করবে ডিজিটাল বিপ্লব।

বাংলাদেশ এই ডিজিটাল বিপ্লবে সামিল হয় ২০০৯ সালে। গণমানুষের নেত্রী শেখ হাসিনা ২০০৮ সালের ১২ ডিসেম্বর জাতীয় নির্বাচনের প্রাক্কালে রুপকল্প ২০২১ ঘোষণার মধ্য দিয়ে এ দেশের মানুষকে স্বপ্ন দেখান ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের। এটি তার অন্যতম একটি রাজনৈতিক অঙ্গীকার। ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর জাতীয় নির্বাচনে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের অঙ্গীকারটিও জনগণের ম্যান্ডেট লাভ করে। ২০০৯ সালের ৬ জানুয়ারি দায়িত্ব গ্রহণের পর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের প্রাধিকার কর্মসূচিতে স্থান পায় ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ। শুরু হয় তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর অর্থনীতি গড়ে তোলার নবতর যাত্রা।

রুপকল্প ২০২১ এ ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তায়নে চারটি স্তম্ভের উল্লেখ করা হয়েছে;

১. মানবসম্পদকে একুশ শতকের উপযোগী করে গড়ে তোলা;

২. সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য এবং অর্থপূর্ণভাবে নাগরিকদের সংযুক্ত করা;

৩. সকল নাগরিকের দ্বারপ্রান্তে সেবা পৌঁছে দেয়া এবং

৪. তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যক্তি মালিকানাধীন খাতসমূহ ও বাজার ব্যবস্থাকে আরো উৎপাদনশীল ও প্রতিযোগিতামূলক করে গড়ে তোলা।

বিগত পাঁচ বছর ১০ মাস সরকার এ চারটি স্তম্ভের লক্ষ্য পূরণে আইসিটি অবকাঠামো উন্নয়ন, নিবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ, অর্থব্যবস্থার ডিজিটাইজেশন, চার হাজার ৫৪৭টি ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার, ৩২১টি পৌরসভা ডিজিটাল সেন্টার ও সিটি কর্পোরেশনের অধীন ৪০৭টি ওয়ার্ড ডিজিটাল সেন্টার, মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম, স্বাস্থ্য সেবায় টেলিমেডিসিন সেন্টার, ২৫ হাজার ওয়েব পোর্টালের জাতীয় তথ্যবাতায়ন, জাতীয় ই-তথ্য কোষ, আখ চাষীদের জন্য ই-পূর্জি চালুসহ বিভিন্ন সেবার ডিজিটাইজেশন করায় দেশের অধিকাংশ মানুষ এর সুফলভোগী। শুধুমাত্র ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকেই প্রতিমাসে ৪৫ লক্ষ মানুষ ৬০ ধরণের সেবা গ্রহণ করছে।

সরকার পাশাপাশি তথ্যপ্রযুক্তি বান্ধব পরিবেশ তৈরি করায় আইসিটি খাতে এর ইতিবাচক প্রভাব লক্ষনীয়। বর্তমানে ইন্টারনেটের ব্যবহার চার কোটি ছাড়িয়ে গেছে। মোবাইল ফোনের ব্যবহার ১১ কোটিরও বেশি। মুঠোফোনের গবেষণা প্রতিষ্ঠান মোবিফোর্জের প্রতিবেদনে দক্ষিণ এশিয়ায় জনসংখ্যার তুলনায় মোবাইল ফোনের গ্রাহকের সংখ্যা বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি। তাদের হিসেবে বাংলাদেশের জনসংখ্যার ৭৫ শতাংশই মোবাইল ফোনের গ্রাহক।

বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সফটওয়্যার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস (বেসিস) এর তথ্য মতে, ২০১২-১৩ অর্থবছরে শুধুমাত্র সফটওয়্যার রপ্তানি থেকে আয় হয় ১০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা পূর্ববর্তী বছরের রপ্তানি আয় থেকে প্রায় ৫০ শতাংশ বেশি। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে সফটওয়্যার রপ্তনি আয় ২৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ছাড়িয়ে যাবে বলে আশা করছে বেসিস। হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার খাত প্রচুর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করছে। ইতোমধ্যে আইটি সেবার মাধ্যমে ৩০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের বাজার সৃষ্টি হয়েছে এবং প্রায় এক লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের অভিযাত্রায় আমাদের কিছু গৌরবময় অর্জন রয়েছে। যা বহির্বিশ্বে তথ্যপ্রযুক্তি খাতে আমাদের ইতিবাচক ভাবমূর্তিকে তুলে ধরেছে। ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক পুরস্কার আমাদের জন্য অনন্য সম্মান বয়ে এনেছে। জাতিসংঘ সাউথ-সাউথ অ্যাওয়ার্ড, ওয়ার্ল্ড সামিট অন ইনফরমেশন সোসাইটি অ্যাওয়ার্ড, ওয়ার্ল্ড ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সার্ভিসেস অ্যালায়েন্স অ্যাওয়ার্ড বাংলাদেশের ঘরে এসেছে। আর এইতো সেদিন ২২ নভেম্বর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি উপদেষ্টা জনাব সজিব ওয়াজেদ জয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষে গ্রহণ করেন জাতিসংঘ সাউথ-সাউথ কো-অপারেশন ভিশনারি অ্যাওয়ার্ড। গত মাসেই মাননীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলকের নেতৃত্বে বাংলাদেশ দলের নিরলস পরিশ্রম ও কূটনৈতিক দক্ষতায় দ্বিতীয় বারের মতো আন্তর্জাতিক টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়নের কাউন্সিল সদস্যপদ লাভ করে বাংলাদেশ। এরপরও আমাদের আইসিটিভিত্তিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে অনেকটা পথ পাড়ি দিতে হবে। গড়ে তুলতে হবে দক্ষ মানব সম্পদ।

সরকারের চার ধাপে আইসিটিভিত্তিক উন্নয়নঃ

মানুষের সাফল্যের জন্য প্রয়োজন হয় সুযোগের। মানুষকে যদি সুযোগ তৈরি করে দেয়া যায় তারা সাফল্যের সিঁড়ি বেয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারে। সরকার মানুষের জন্য সেই সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে চার ধাপে নানা প্রকল্প ও কর্মসূচির বাস্তবায়ন করছে। আর এতে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে দক্ষ মানব সম্পদ গড়ে তোলার। কারণ দক্ষ মানব সম্পদ ছাড়া তথ্যপ্রযুক্তি খাতের বিকাশ সম্ভব নয়।

চার ধাপে যেভাবে কাজ হচ্ছেঃ

প্রথম ধাপেঃ তৃণমূলে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারগুলো শুরু থেকেই কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করেছে। চার বছরে এসব ডিজিটাল সেন্টার গ্রামে এক লক্ষেরও বেশি তরুণ-তরুণীকে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ দিয়েছে। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, পলিটেকনিক, ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট এবং বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিবছর আরও বেশ কয়েক হাজার তুরণ-তরুণী কম্পিউটার ও আইটি প্রশিক্ষণ নিয়ে বের হচ্ছে। এসব কম্পিউটার ও আইটি প্রশিক্ষিত তরুণ-তরুণীদের টার্গেট করেই তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ দক্ষ মানব সম্পদ গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে।

দ্বিতীয় ধাপঃ প্রথম ধাপের এই সব কম্পিউটার ও আইটি প্রশিক্ষিত তরুণ-তরুণীদের জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ দক্ষ মানব সম্পদ গড়ে তোলায় বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচির বাস্তবায়ন করছে। ফিল্যান্সার বা মুক্ত পেশাজীবী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য লার্নিং অ্যান্ড আর্নিং প্রকল্প এবং মোবাইল অ্যাপ তৈরিতে দক্ষ করে তোলার জন্য জাতীয় পর্যায়ে মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন তৈরির প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলছে।

তৃতীয় ধাপঃ তৃতীয় ধাপে তৈরি হচ্ছে তৈরি হচ্ছে উদ্যোক্তা। ফ্রিল্যান্সার টু অনট্রাপ্রেণর কর্মসূচিতে এসব উদ্যোক্তা তৈরি হচ্ছে। বর্তমানে যেসব ফ্রিল্যান্সার তৈরি হচ্ছে তাদেরকেই উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে। যাতে একজন উদ্যোক্তা বিশ জনেরও অধিক ফ্রিল্যান্সারকে সঙ্গে নিয়ে কাজ করতে পারেন।

চতুর্থ ধাপঃ অনট্রাপ্রেণর টু বিজনেস প্রসেস আউটসোর্সিং (বিপিও)। দেশের সাত বিভাগ ও বেশ কয়েকটি জেলায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ হাই-টেক পার্ক নির্মাণ করছে। ভবিষ্যতে সেখানে এসব উদ্যোক্তাদের বিপিও পেশাজীবী হিসেবে গড়ে তোলার সুযোগ করে দেয়া হবে।

এই চার ধাপের বিশ্লেষন করলে আমরা দেখতে পাই তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ দ্বিতীয় ধাপে লার্নিং অ্যান্ড আর্নিং প্রকল্পের আওতায় দেশে মুক্তপেশাজীবী (ফ্রিল্যান্সার) তৈরি করছে। এ নিবন্ধে সে বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়েছে।

আত্মনির্ভরশীলতায় আউটসোর্সিং খাত ও লার্নিং আর্নিং প্রকল্পঃ

বর্তমানে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার গতি অতীতের যেকোন সময়ের তুলনায় বেশি। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও)'র এক পরিসংখ্যানে বলা হয়েছে, আগামী এক দশকের মধ্যে বিশ্বে আত্মনির্ভরশীল ব্যক্তির সংখ্যা হবে বর্তমান জনসংখ্যার ৪০ শতাংশ। ঘরে বসে আয়ের পাশাপাশি আত্মনির্ভরশীল ও আপন পেশাগত দক্ষতা প্রদর্শনের সাহায্যে টাকা আয়ের মাধ্যমে নিজের ক্যারিয়ারকে বিকশিত করা যায় আউটসোর্সিংয়ের সাহায্যে। পরিবারের সবার কাছাকাছি থাকার মাধ্যমে পারিবারিক বন্ধন আরও অটুট হয়। আর এক্ষেত্রে সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত মাধ্যম হচ্ছে আউটসোর্সিং। সহজ আয়ের সেরা মাধ্যম হিসেবে এরই মধ্যে সমাদৃত হয়ে উঠেছে এটি। বহির্বিশ্বের কাজ কম্পিউটারের মনিটরে সাজিয়ে দিচ্ছে কয়েকটি মধ্যস্থতাকারী ওয়েবসাইট, যাদের বলা হচ্ছে মার্কেটপ্লেস। এ মার্কেটপ্লেসই হতে পারে আয়ের নতুন ঠিকানা। বিশ্বজুড়ে জনপ্রিয় এসব মার্কেটপ্লেসের মধ্যে রয়েছে মুক্ত পেশাজীবীদের কাজের সুযোগ। এখানে কাজ করে যে কেউ সফল হতে পারে। বিশ্বের বড় বড় প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের অনেক কাজই এখন বাইরের প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি দিয়ে করিয়ে নেয়। যুক্তরাষ্ট্র একাই বছরে প্রায় ৫০ হাজার কোটি ডলারের আউটসোর্সিং করছে। শুধুমাত্র ইল্যান্স-ওডেস্ক মার্কেট প্লেসে ১.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের কাজ রয়েছে।

বর্তমানে বিশ্বে ৪২২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের স্টাফিং মার্কেট রয়েছে যার মাত্র ১০ শতাংশেরও কম অনলাইন মার্কেটে এসেছে। সময় এসেছে আউটসোর্সিংসহ অনলাইনভিত্তিক কাজের দ্রুত প্রসার ঘটানো এবং বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের স্টাফিং এর বাজারকে অনলাইন বাজারে নিয়ে আসার। বাংলাদেশ এ বাজার ধরতে প্রয়াস অব্যাহত রেখেছে। প্রয়োজনীয় যোগ্যতা থাকলে যে কেউ কাজগুলো পেতে বিডে অংশ নিতে পারে।

লার্নিং অ্যান্ড আর্নিং প্রকল্প: তরুণদের সামনে অপার সম্ভাবনা:

বাংলাদেশ আউটসোর্সিংয়ের উৎস থেকে অর্থ উপার্জনকে উৎসাহিত করছে। ২০১২ সালে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় দেশের শিক্ষিত তরুণ-তরুণীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ফ্রিল্যান্সার হিসেবে গড়ে তোলার জন্য লার্নিং অ্যান্ড আর্নিং কর্মসূচি গ্রহণ করে এবং প্রথম পর্যায়ে প্রায় ১৫ হাজার ফ্রিল্যান্সার তৈরি করে। দ্বিতীয় পর্যায়ে লার্নিং অ্যান্ড আর্নিং প্রকল্পের অধীনে ৫৫ হাজার শিক্ষিত তরুণ-তরুণীকে প্রশিক্ষণের উদ্যোগ নিয়েছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ।

বাংলাদেশের জন্য আউটসোর্সিংই হচ্ছে এ সময়ের সবচেয়ে টেকসই কর্মক্ষেত্র। শিক্ষিত তরুণ-তরুণীদের ওয়েব, গ্রাফিক্স ডিজাইন, সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন, সোসাল মার্কেটিং, থিম ডিজাইন, প্রোগ্রামিং,, ওয়েবসাইট ম্যানেজমেন্ট, লিংক বিল্ডিং, ডাটা এন্ট্রি টাইপিং, আর্টিকেল বা ব্লগ রাইটিং বিষয়ে প্রশিক্ষিত করে আউটসোর্সিংয়ের সম্ভাবনাময় খাত থেকে অর্থ আয়ের সুযোগ করে দেবে লার্নিং অ্যান্ড আর্নিং প্রকল্প।

সরকারি, বেসরকারি এবং ব্যাক্তি উদ্যোগে দেশে এখন প্রায় পাঁচ লক্ষাধিক তরুণ-তরুণী আউটসোর্সিংয়ের উৎস থেকে আয় করার জন্য বিভিন্ন মার্কেট প্লেসে নিবন্ধন করেছে। এদের মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি সক্রিয় ফ্রিল্যান্সার। যারা বছরে ৫০ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি করছে। বাংলাদেশের তরুণ-তরুণীরা যে মার্কেট প্লেসটিতে সবচেয়ে বেশি নিবন্ধন করেছে সেটি হচ্ছে ইল্যান্স-ওডেস্ক। এ মার্কেট প্লেসটিতে নিবন্ধিত ফ্রিল্যান্সারের সংখ্যা সাড়ে চার লাখ। ২০১৩ সালে ইল্যান্স-ওডেস্ক থেকে আয় ২১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা পূর্ববর্তী বছরের আয় থেকে ৩৫ শতাংশ বেশি। ২০১৪ সালের আয় ২০১৩ সালের প্রবৃদ্ধির হারের চেয়েও বেশি হবে বলে আশা করছে ইল্যান্স-ওডেস্ক। বাংলাদেশের ফ্রিল্যান্সাররা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মার্কেটপ্লেসে আউটসোর্সিং কাজের ক্ষেত্রে শক্ত অবস্থান করে নিয়েছে। ইল্যান্স-ওডেস্ক একীভূত হওয়ার আগে ২০১২ সালে ওডেস্কের শীর্ষ ১০ এর তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান ছিল তৃতীয়। ইল্যান্স-ওডেস্ক একীভূত হওয়ার পর বিশ্বের ১৮৫টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থান ৭ম।

আউটসোর্সিংয়ে আন্তর্জাতিক র‍্যাংকিংয়ে বাংলাদেশের অবস্থান ক্রমশই সংহত হচ্ছে। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক শীর্ষ ব্যবস্থাপনা পরামর্শক প্রতিষ্ঠান এটি কারনির গ্লোবাল সার্ভিস লোকেশন (জিএসএল) সূচকে বিশ্বের ৫১টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো ২৬তম অবস্থানে উঠে এসেছে। এটি কারনির প্রতিবেদনে বলা হয় আউটসোর্সিংয়ে সঠিক গন্তব্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। এর ফলে বিশ্বস্ততা এবং নির্ভরযোগ্যতার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের আউটসোর্সিং স্ট্যাটাসে একটা ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক প্রযুক্তি গবেষণা ও পরামর্শক প্রতিষ্ঠান গার্টনারের প্রতিবেদনে ৩০ শীর্ষ আউটসোর্সিং গন্তব্যের দেশের তালিকায় রয়েছে বাংলাদেশের নাম। আউটসোর্সিংয়ের এই অপার সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে দেশে আত্মনির্ভরশীল মানুষ তৈরি করছে তথ্য ও যোগাযোগ রাখছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ।

তরুণেরাই গড়বে দেশ: প্রয়োজন তাদের দক্ষ মানব সম্পদে পরিণত করা:

ইতিহাসের দিকে চোখ ফেরালে দেখা যায়, আমাদের সব অর্জন অদম্য তারুণ্যেরই জয়গাথা। তাদের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করা গেলে তারাই দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। নানা সৃষ্টিশীল উদ্যোগ, অর্জনে, কৃতিত্বে তারাই আমাদের জন্য নতুন আশার সঞ্চারক। এই তরুণদেরই আধিক্য এখন বাংলাদেশে।

গত ১১ নভেম্বর ইউএনএফপিএ'র প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে এখন ১০ থেকে ২৪ বছর বয়সী তরুণের সংখ্যা পৌনে পাঁচ কোটি। এর সঙ্গে ২৫ থেকে ৪০ বছর বয়সী যুব জনসংখ্যাকে ধরলে বলা যায় মোট জনসংখ্যার তিন ভাগের দুই ভাগই টগবগে তরুণ। আর 'সিআইএ-দ্যা ওয়ার্ল্ড ফ্যাক্টবুক' এর মতে, যখন কোন দেশের কর্মক্ষম লোকের সংখ্যা আনুপাতিক হারে সবচেয়ে বেশি থাকে তখন একটি দেশ ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্টে বা জনসংখ্যাতাত্ত্বিক বোনাসে প্রবেশ করে। ২০১২ সালে বাংলাদেশ এ ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্টে প্রবেশ করেছে। কর্মক্ষম মানুষের এই প্রবৃদ্ধি অব্যাহত থাকবে আগামী আরও দুশক। ঠিক এরকম জনসংখ্যা-সুবিধা নিয়েই ১৯৬৫ থেকে ১৯৯০ সালের মধ্যে পূর্ব এশীয় 'টাইগার' অর্থনীতির দেশগুলো উন্নতি করেছিল। চীন বিপ্লবের পরের উত্থানও ছিল অনেকটা তরুণদের রক্ত ও ঘামের ফসল। ষাটের দশকে দক্ষিণ কোরিয়াও একই রকম জনসংখ্যা সুবিধা অর্জন করেছিল। তারা একে কাজে লাগিয়ে আজ শিল্প সমৃদ্ধ দেশ। তারা বিশ্বে তথ্যপ্রযুক্তিতে অগ্রগামী দেশের শীর্ষ তালিকায় স্থান করে নিয়েছে।

আশার কথা হচ্ছে, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ডিজিটাল বাংলাদেশের রুপকার। তার তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি উপদেষ্টা খ্যাতিমান কম্পিউটার বিজ্ঞানী সজিব ওয়াজেদ জয় বয়সে তরুণ, আধুনিক ও বিজ্ঞান মনস্ক। তথ্য ও যোগাযযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক সর্বকনিষ্ঠ সাংসদ, তারুণ্যের চিন্তা চেতনার ধারক ও বুদ্বিদীপ্ত। তাদের ভাবনায় রয়েছে আমাদের যুবশক্তিকে তথ্যপ্রযুক্তিতে প্রশিক্ষিত করে দক্ষ মানব সম্পদ হিসেবে গড়ে তোলার। বিশেষ করে যারা মোটামুটি শিক্ষিত এবং প্রতিবছর বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নিয়ে বের হচ্ছে।

আমাদের প্রত্যাশা, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ লার্নিং অ্যান্ড আর্নিং, বাড়ি বসে বড়লোক, ফ্রিল্যান্সার টু অনট্রাপ্রেণর, মোবাইল অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট, লিভারেজিং আইসিটি ফর গ্রোথ, এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড গভর্নেন্স (এলআইসিটি) প্রকল্পর মতো দক্ষ মানব সম্পদ তৈরির আরও নতুন উদ্ভাবনী প্রকল্প ও কর্মসূচি চালু করে জনসংখ্যাতাত্ত্বিক সুবিধাকে কাজে লাগাবেন। শিক্ষিত তরুণ-তরুণীদের প্রশিক্ষণের আওতায় নিয়ে আসবেন। এটা করা সম্ভব হলে ২০১৭ সালের মধ্যেই দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অবদান অন্তত ২ শতাংশ নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। তখন শুধু আত্মনির্ভরশীল মানুষ নয়, বিশ্বে বাঙালিরা একটি আত্মনির্ভরশীল জাতি হিসেবে গড়ে উঠবে। যে স্বপ্ন দেখেছিলেন আমাদের মহান নেতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

---

[*] *লেখক পরিচিতি : **অজিত কুমার সরকার**, কমিউনিকেশন কনসালট্যান্ট, লিভারেজিং আইসিটি ফর গ্রোথ, এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড গভর্নেন্স প্রকল্প; প্রবন্ধটি ২৬ জানুয়ারি ২০১৪ তারিখে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ আয়োজিত 'লার্নিং অ্যান্ড আর্নিং ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প'-এর সেমিনারে উপস্থাপিত;*